আলোকিত আমেরিকা

চণ্ডীদাস ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

আমেরিকা বিশ্বের বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশ। পুঁজি এখানকার রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ। পুঁজি এবং বিনিয়োগে অর্থনৈতিক উন্নতির চরম বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে একদা ইংল্যান্ড অভিবাসী দেশে। ধনবন্টন ব্যবস্থায় কোনো বৈষম্য এতদিন এদেশে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারও ছিল না কোনো ত্রুটি। রাষ্ট্র যেমন ধনবলে বলীয়ান ছিল—দেশের মানুষও তেমনি আর্থিক স্বচ্ছলতায় উৎকর্ষ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। ভোগবাদী জীবনের সব সুখ আমেরিকানবাসী উপভোগ করেছে দীর্ঘদিন। বেশিরভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ছিল প্রশ্নাতীত। দারিদ্র্য একেবারে ছিল না বললে সত্যের অপলাপ হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে তার খুবই নগণ্য বলা যায়। নিত্য নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাবে মার্কিনী শিল্প দিনে দিনে স্ফীতি লাভ করেছে। বিশ্ব বাজারকে আমেরিকা যেভাবে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করেছে তা একমাত্র মার্কিনীদের দিয়েই সম্ভব। পৃথিবীর বাজার অনেকটা আমেরিকা পরিচালনা করে। আর সেই কারণে ইউ এস ডলারই একমাত্র বিশ্ব মুদ্রা যার দ্বারা সারা জগতে ক্রয় বিক্রয় কাজ চালানো সম্ভব।

অত্যন্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকা। পৃথিবীর সভাকক্ষে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক নীতি। কার্যক্রিয়া আমেরিকার দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে আমেরিকাই শেষ কথা। আমেরিকার বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে এই দেশ জগতকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবে এটাই স্বাভাবিক।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে আমেরিকা আর্থিক মন্দার কবলে পড়ে। উত্তরোত্তর এই মন্দা বৃদ্ধি পেতে পেতে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় এসে পৌঁছায়। দেড়শো বছরের প্রাচীন ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্স সেপ্টেম্বর মাসে দেউলিয়া হয়ে যায়। এর আগে আর্থিক সংস্থাগুলি প্রচণ্ড মার খায় ঋণের বাজারে। এ. আই. জি. র মত বিরাট বিমা সংস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে। আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ (এ.আই.জি)-র সংকট বিমা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত আনে। মেরিন লিঙ্ক বা লেম্যান ব্রাদার্সের দেউলিয়াও মার্কিন অর্থনীতিতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়। ধনসম্পদে বলীয়ান দেশটা রাতারাতি আর্থিক ধসে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্দশা আর অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। যার প্রভাব পড়ল সারা দেশের অর্থনীতিতে। সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারেও দেখা দিল বড়ো ধরনের ধস। কেঁপে গেল অর্থনীতির মূল স্তম্ভ।

১৯২৯ সালে আমেরিকার এমনি এক ভয়ঙ্কর আর্থিক মন্দায় দেশ বিপর্যস্ত হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর লেগেছিল তা পুনরুদ্ধার করতে।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পর্যটন শিল্প বিশ্বের মন্দার বাজারে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

খুব সামান্য প্রভাব হয়ত পড়েছে। কিন্তু কখনই সেভাবে ধসে পথে বসেনি। বরং ৯/১১ আমেরিকায় জঙ্গি হানায় পর্যটন শিল্প অনেক বেশী মার খেয়েছিল। অনেক দেশ বিমান পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে এভাবে পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আর বেড়ানো, ভ্রমণ তো শুধু ধনীদের, কর্পোরেট ব্যক্তিদের করায়ত্ব নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত বহু মানুষ দেশ বিদেশে বেড়িয়ে আনন্দ পায়।

পর্যটন মূলত ব্যবসায়িক শিল্প হলেও এর অন্য একটা আহ্লাদিত প্রচেষ্টার প্রয়াস রূপ চোখে পড়ে। ভ্রমণ মানুষের শুধু তো সখ নয়। জীবনের গভীরে প্রথিত কোনো বিশ্বাস আনন্দ রসময়তার উপলব্ধির স্বরূপ নির্ণয়ও বটে। নিজেকে নতুন করে জানা চেনার সুযোগ করে দেয়। মন্দার সময়ে ভ্রমণের বাধা কোনোভাবেই আমাদের দেশে কালো ছায়া ফেলেনি। পর্যটন শিল্পে ভারতের মন্দার প্রভাব মন্দ—এটুকুই আশার কথা। ভারতবর্ষের ট্যুরিস্ট সংস্থাগুলি কোথাও পাততাড়ি গোটায়নি। রমরমিয়ে ব্যবসা করছে। এমনকী দেশী-বিদেশী সংস্থা এদেশে বিদেশে যাত্রীদের বেড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরছে—স্মৃতি এবং সুখের ডালি ভরে উঠছে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায়। মানুষ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে এইসব সংস্থার সহায়তায় বিদেশে বেড়িয়ে আসতে দ্বিধা করছে না।

আমার আমেরিকা ভ্রমণের পটভূমিতে বর্তমান পরিস্থিতির কিছু চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম মাত্র। পাঠক এখনকার অবস্থার সঙ্গে তিন বছর আগের অবস্থার তুলনামূলক বিচার না করলেই খুশী হব। এতৎসত্ত্বেও একটা কথা বলা দরকার আমেরিকা কখনই সে অর্থে ভ্রমণ শ্রেষ্ঠ দেশ নয়, যেমন ইউরোপ। কাজের দেশ। ব্যবসার দেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা এবং গবেষণার দেশ হিসাবে আমেরিকা খ্যাত—কিন্তু শিল্প, ভাস্কর্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক পটভূমিতে ইউরোপ উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান। নৈসর্গিক এবং নান্দনিক শিল্পকলা শোভিত সৌন্দর্যের সঙ্গে মার্কিন দেশের তুলনা চলে না। তবুও পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে আমেরিকা আমেরিকাই। তার কৃষ্টিও অনন্য। অসংখ্য দেখবার জিনিস পর্যটকদের মন ভুলিয়ে দেয়। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নয়নে যে চমক সৃষ্টি মার্কিনীরা করেছেন তা স্বচক্ষে না দেখলে অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যায়। সেদিক থেকে শুধু আমেরিকা বিরাট সমৃদ্ধ দেশ নয়, তার চেয়ে বড়ো মহা আকর্ষণীয় বিশ্ব বন্দিত রাষ্ট্র—যা বিস্ময়ের উদ্রেক সৃষ্টি করে।

পুস্তকে মুদ্রিত বেশিরভাগ ছবিই আমার নিজের তোলা। তাই এখানে ফটোগ্রাফারের নাম দেওয়া হয়নি। আরও অসংখ্য ছবি রয়ে গেল যেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

পুস্তক রচনায় কল্যাণীয়া আবীরা ঘোষ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অধ্যাপক বন্ধু ডঃ বলাইচাঁদ হালদার কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। এদের সকলকে প্রীতি ধন্যবাদ জানাই।

জানুয়ারি, ২০০৯ চণ্ডীদাস ঘোষ
কলকাতা

স্বদেশ এবং বিদেশ ভ্রমণ নতুন করে মনে নানা ভাব চিন্তার জন্ম দেয়। শৈশবকাল থেকে ভারত পরিক্রমা শুরু। বেশ মনে পড়ে আমি তখন স্কুল ফাইনাল পাশ করে সদ্য কলেজে প্রবেশ করেছি। সালটা ১৯৫৮ হবে। প্রথম বাঙলার বাইরে বেড়াবার সুযোগ এল। বলা বাহুল্য তৎপুর্বে পশ্চিমবঙ্গের কোনো দূরবর্তী জেলা ঘোরার সুযোগ তখনও আমার হয়নি। পুজোর সময় আগ্রা-দিল্লি হরিদ্বার ভ্রমণ। সে স্মৃতি মনের মণিকোঠায় আজও উজ্জ্বল হীরকের মতো দ্যুতিময়। সদ্য বিবাহিত দিদি জামাইবাবু আর আমার ছোড়দা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলেন। মনে আছে ট্রেনে উঠে কী উত্তেজনা। অষ্টমীর সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তুফান মেল ছাড়ল। জানালা থেকে এক মুহূর্তের জন্য চোখ আমার সরছে না। যা দেখছি তাতেই বিস্ময়। বিকালে মধুপুর শিমুলতলা দিয়ে ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে—আর আমি অফুরন্ত কৌতূহল, আনন্দ নিয়ে বাহিরের দৃশ্যাবলি দেখছি। স্টেশন সংলগ্ন কোয়ার্টার, তোলা উনুনে একমাথা ঘোমটা টেনে বিহারি বধূ উনুনে আগুন ধরাচ্ছে, একপাল গোরু নিয়ে রাখাল বালক দুলকি চালে চলেছে খেতের আল পেরিয়ে, বাবুই পাখির বিচিত্র বাসা দেখে সকলের উল্লাস প্রকাশ, দূরে কাছে, জীবনে সেই প্রথম পাহাড় দেখার উন্মাদনা, আর বিস্তৃত প্রান্তর যেন ট্রেনের সঙ্গে একই গতিতে আমাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে। স্মৃতির ভাণ্ডারে তা আজও সযত্নে রক্ষিত। এত বছর হল কিছুই ভুলিনি। ভুলিনি রাত্রে ট্রেনের রিজার্ভ বার্থে সবাই যখন ঘুমে মগ্ন আমি তখন কলম ধরে লিখে চলেছি। হয়তো প্রথম বাইরে বেড়াবার আনন্দ উত্তেজনায় লেখনী সচল হয়েছিল। কিন্তু তার প্রকাশে কতটা সাহিত্যিক মূল্য ছিল তাতে ঘোর সংশয় আছে। কিন্তু যে প্রেরণা সেদিন মনকে আলোড়িত, আবেগ তাড়িত করেছিল তার মূল্য এই বয়সেও অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। তারপর আগ্রার তাজমহল, আগ্রা ফোর্টের ঐতিহাসিক দৃশ্যপট, ফতেপুর সিক্রি অতীত জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠা আমার মনের ভাব

সমুদ্রে তুফান তুলেছিল। সেই সুদূর প্রবাসে নবমীর পুজো মণ্ডপে ফেলে আসা কলকাতার পুজোর জন্য মন কেমন করা ভাব আমাকে সেদিন আচ্ছন্ন করেছিল। আমরা তিনদিন আগ্রায় ছিলাম। সেদিন যেসব স্থান পরিদর্শন করেছিলাম আজ তা সবই স্মরণে রয়েছে। দিল্লি হয়ে আমরা হরিদ্বারে গিয়েছিলাম। দিল্লিতে রেলওয়ের সুন্দর কেটারিং-এ উৎকৃষ্ট মুরগির মাংস আর দেরাদুন রাইসে আহার আজও আমার মুখে লেগে আছে। এত ছোটো ব্যাপার কিন্তু কিছুই ভুলিনি। রাত দশটার পর হরিদ্বারগামী ট্রেনে চেপে যাওয়ার সময় গভীর রাত্রে হৈ-হুল্লোড় চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে দেখতে পেলাম সবাই বোঁচকা-বুচকি নিয়ে ট্রেন থেকে নামতে ব্যস্ত। আমার পায়ে লেগে একটা মাটির কুঁজো গড়িয়ে আর এক প্রান্তে চলে গেল। কী ব্যাপার! আমাদের এই কোচ এখানে বাদ হয়ে যাবে। আমাদের অন্য কোচে উঠতেই হবে। আমরাও নামবার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় খবর এল এই কোচ কাটা হবে না। ভাগ্যিস নামিনি।

হরিদ্বার স্টেশনে নেমে আর এক বিস্ময়। আমরা অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে যাত্রা শুরু করেছি। কিন্তু এখানে এত ঠান্ডা ভাবতেই পারছি না। বলা বাহুল্য সেই সময় পাঁচের দশকে অনেক তাড়াতাড়ি শীত পড়ত। নভেম্বরে তো বেশ ভালো রকম ঠান্ডা, এখন যা অকল্পনীয়। হরিদ্বারের গঙ্গার হিমশীতল জল, শিকল বাঁধা ঘাটে অজস্র মানুষের স্নান, চারদিকে অসংখ্য মাছের মধ্যে অবগাহন, দূরে মনসা পাহাড়, চণ্ডী পাহাড়, হর-কী পউরি সন্ধ্যায় গঙ্গার জলে ছোট ভেলায় প্রদীপ ভাসানো কেমন এক; মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই প্রদীপ ভাসানোর প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ছোড়দির চমৎকার মন্তব্য। কলার পাত্রে প্রদীপ জ্বেলে হর কী পউড়িতে মানুষ নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার কামনা পোষণ করে। ছোড়দার বিবাহ আসন্ন। তাঁরই পছন্দ করা পাত্রী। ছোড়দি শুধু আমাকেই বললেন, 'ছোড়দা নিশ্চয় ইলাকে (ছোড়দির বান্ধবীও বটে) স্মরণ করে প্রদীপ ভাসাচ্ছে।" আমি উপভোগ করলাম ছোটদির কথা।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ। আজকের হৃষীকেশ আর সেদিনের হৃষীকেশের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ১৯৫৮ সালে দেখা সেখানকার চিত্র আর এই সেদিন ২০০৪ সালে পুনদর্শনে কোনো মিল খুঁজে পাই না। সেদিনের সেই নির্জনতা হিমালয়ের কোলে সাধুসন্তদের ধ্যানরত রূপ হৃষীকেশকে পুণ্যভূমির পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিল। আজ তো সেখানে কোলাহল, ইমারত ঘেরা ঘরবাড়ি, মন্দির, নানা দ্রব্যসামগ্রী ভরা বিপণন কেন্দ্রের জেরে পুণ্যভূমির মাহাত্ম্য নিষ্প্রভ। কী দেখেছি আর এখন কী দেখছি। দুনিয়াই বদলে যাচ্ছে আর এই সামান্য তীর্থক্ষেত্র। একদিন যা গভীর অরণ্য ছিল আজ সেখানে নগর সভ্যতার চোখ ঝলসানো রূপ! কৃষিক্ষেত্রে ভরা ভূমি বহুতল অট্টালিকার ভারে অস্তিত্বহারা। আধুনিকতার জোয়ারে সারা বিশ্ব প্লাবিত। মানুষের চিন্তাধারায় আজ কত পরিবর্তন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুনিয়াটাকে পালটে দিয়েছে। আরও পালটাবে। বস্তুগত ঐশ্বর্যের মোহে

আচ্ছন্ন পৃথিবী নিত্য নতুন ভোগ্যসম্ভার তৈরি করছে। মানুষ মৌমাছির মতো সেই ভোগ সর্বস্ব মধুর চাকে আষ্টেপৃষ্টে লিপ্ত। এর থেকে বের হবার আর পথ নেই, বাইরের সুখ আরাম আমাদের অন্তরের সুখকে হরণ করছে প্রতিনিয়ত। প্রাপ্তির প্রাবল্যে আত্মিক সম্পর্কের বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠছে। এগিয়ে চলো, আরও এগিয়ে চলো আধুনিক বিপুল ভোগবাদের দিকে। বিজ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি সবই সেখানে উৎসর্গীকৃত। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উন্নতির চরম শিখরের দিকে অগ্রবর্তী, কিন্তু জ্ঞানের জগৎ হচ্ছে স্তিমিত, পাণ্ডিত্য লুপ্তপ্রায়। পৃথিবীতে প্লেটো, সক্রেটিস, রোমা রোঁল্যা, বার্নাড শ', রাসেলের যুগ শেষ হতে চলেছে।

বস্তুবাদ একমাত্র সত্য। তার সর্বগ্রাসী প্রভাব একবিংশ শতাব্দীতে তীব্রভাবে অনুভূত। বিশ্বের বিশাল আঙিনায় যাবার দরকার নেই। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে আধুনিক ভোগ জীবনের বস্তুবাদী রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারব। এই বঙ্গে প্রতিবছর যত উচ্চ মেধাবি ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে আসছে তাদের প্রায় সকলেই ছুটছে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী হতে। কারণ ভবিষ্যতে তাতে পয়সা উপার্জন বেশি মাত্রায় সম্ভব। কেউ-বা বাণিজ্য কিংবা নির্বাহ পরিচালন শাস্ত্রে দক্ষ হতে চাইছে। উদ্দেশ্য একই। অল্প বয়সে বহু অর্থের মালিক হওয়া। অতি উচ্চ মেধাবী ছাত্রের কেউ আর জ্ঞানের জগতে আসতে চায় না। পঠনপাঠন, জ্ঞান দান, কলা-গবেষণা চর্চায় অতি ধীমান ছাত্ররা আকৃষ্ট হচ্ছে না। ফলে কলা বিদ্যায় আমাদের দৈন্যদশা প্রকট হচ্ছে দিন দিন। আগে এসব শাস্ত্রে কত অসাধারণ মেধাবী ছাত্র আগ্রহ সহকারে পাঠ নিত। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আগের প্রথিতযশা অধ্যাপক ক্রমশ বিরল। এ আক্ষেপ আমার মনকে পীড়িত করে।

প্রসঙ্গান্তর থেকে প্রসঙ্গে ফেরা যাক। সেবার আমরা হরিদ্বার থেকে আবার দিল্লিতে আসি। মনে আছে দুদিন ধরে দিল্লি বেড়িয়েছিলাম। যা দেখেছি সবই বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। কত কৌতূহলে প্রচণ্ড উৎসাহে কুতবের মিনার স্পর্শ করেছি। ছোড়দিও উঠেছিল অত সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে কুতবের শীর্ষে। দূর থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন দেখে পুলকিত হয়েছি। তবুও তাজমহলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ঠিকই কিন্তু কোথায় মনের কোণে আর কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকেছে। তেমনি রাষ্ট্রপতি ভবন সন্দর্শনে পূর্ণ তৃপ্তি পাইনি। কিন্তু প্রথম দর্শনের উন্মাদনা সর্বত্র অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

সেই শুরু। তারপর দেশ থেকে দেশান্তরে। স্বদেশ থেকে বিদেশে।

প্রথম সমুদ্র সন্দর্শন দিঘায়। পূর্ণ কোজাগরী পূর্ণিমায়। সেও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেবার ১৯৬৩ সালে পুজোর সময় অতি বৃষ্টিতে দিঘার পর্যটক ভাটা সৃষ্টি করল। ফলে ১লা নভেম্বর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন সমুদ্র তটে মানুষের ভিড় জমল। বলা বাহুল্য যা এখানকার তুলনায় কিছুই নয়। তখন দিঘায় দু তিনটের বেশি হোটেল কিংবা আবাসন ছিল না। থাকার জায়গা বলতে কাফেটোরিয়া আর সরকারি বাংলো, গেস্টহাউস—চিপ

ক্যানটিন ভবনের নির্মাণ তখন চলছে। থাকার কোনো স্থান সঙ্কুলান করতে না পেরে আমি আর আমার বন্ধু সুধাংশু দাস যার বাড়ি কাঁথির সাত মাইলে, যার গৃহে আমি আতিথ্য গ্রহণ করব এবং যে আমাকে সেদিন শহর ঘুরিয়ে দিঘায় এনেছে। রাত্রে চিপ ক্যানটিনের দোতলায় আশ্রয় নিলাম। অসম্পূর্ণ নির্মীয়মান দ্বিতল—শুধু চাদর পেতে শুয়ে দুজনে রাত কাটিয়ে দিলাম। সঙ্গে আরও কিছু যাত্রী। তখন দিঘায় শুধুই ঝাউবন। সরকারি ইনস্পেকশন বাংলোর সম্মুখের একমাত্র রাস্তা (এখন যা প্রধান ঘাট) সমুদ্রের কাছে পৌঁছেছে। আর কোথাও ঘাট বা বসার কোনো স্থান নেই। আর ঠিক তার লাগোয়া চারিদিকে গভীর ঘন ঝাউবনের জঙ্গল। মনে আছে সন্ধ্যার সময় কাঁথি থেকে দুই বন্ধু দিঘায় এসে পৌঁছোলাম। পরিপূর্ণ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় প্রথম সমুদ্র সন্দর্শন। ভালো লাগার প্রবল উচ্ছ্বাস মনকে বিমোহিত করেছিল। সেদ্দিন অনেক রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্না ধৌত ফেনিল সাগরে দুধ সাদা রূপ প্রত্যক্ষ করেছি নির্জন ঝাউবনের বালির উপর উপবেশন করে। নীচে খাদ এবং সমুদ্র। দুই বন্ধু গল্পে মশগুল। আর সে কথোপকথন সবই সাহিত্য ঘিরে। কিছুই ভুলিনি। আজকের দিঘার সঙ্গে ৪২ বৎসর আগের দিঘার সামান্যতম মিল নেই।

ঠিক এক বছর পরে ১৯৬৪ সালে পুজোয় পুরী যাত্রা। পুরীর সমুদ্রের উত্তাল রূপ আরও উন্মত্ত বিভীষিকাময় হয়ে উঠল নিম্নচাপজনিত কারণে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে। সমুদ্রের সে রূপ অকল্পনীয়। পুরীর সমুদ্রের ঢেউ খুব বেশি, তার উপর সাইক্লোনিক আবহাওয়ায় তা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় একটা দিনেই তার আগমন এবং পরদিন তার অবসান। ফলে বাকি দুদিন সমুদ্র এবং পুরী দুই উপভোগ করেছিলাম। দুদিন ভুবনেশ্বর কাটিয়ে কোনারক হয়ে পুরীতে আসা। তখনকার পুরানো ভুবনেশ্বর এত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর যা আজও আমাকে নাড়া দেয়। বি. ই. কলেজের দুজন অধ্যাপকদের সঙ্গে একই বাড়িতে আমরা ছিলাম। নিচে উঠোনে পাতকুয়ার জলে স্নান করা, চারদিকে ছোট গাছগাছালি, প্রাচীর দেওয়া অঙ্গন আর সর্বোপরি ওড়িষার বিখ্যাত মন্দিরগুলি যার বেশিরভাগ অবস্থিত পুরোনো ভুবনেশ্বরে সে সবই আমার স্মৃতির মণিকোঠায় স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। এখনও আমরা ভুলতে পারি না প্রথম লিঙ্গরাজের এবং রাজারানির মন্দির দেখার এক ধরনের ব্যাকুলতা। সে অন্য অভিজ্ঞতা। অন্য দর্শন। যেমন কোনারক। আজও আমার কাছে বিস্ময়। বিস্ময় শিল্প নৈপুণ্যের। রাজকীয় মাহাত্ম্যের। সূর্য মন্দিরের অসাধারণ পরিবেশ আরও বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। রাজা নরসিংহ রাও-এর কীর্তিতে মুগ্ধ হয়েছি। সব মিলিয়ে আজ থেকে ৪০ বৎসর আগের দেখার স্মরণীয় স্মৃতি মনে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত।

তারপর ভারতবর্ষের কত দেশ কতভাবে দেখলাম। সে দেখার যেমন বিরাম নেই, তেমনি কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভও সম্ভব হল।

অসংখ্যবার যদি পুরী গিয়ে থাকি তা হলে প্রথম পাহাড়ের দেশ দর্শন সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু বহু দূরে উত্তর ভারতের কাশ্মীরে। সেটা ১৯৬৭ সালের মে মাস। আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে। তার দিদি জামাইবাবু, ভাগনে মিলিয়ে মোটামুটি একটা বড়ো দল। তখন দু রাত্রি ট্রেন জার্নি করে পাঠানকোট আসতে হত। তারপর বাসে জম্মু এবং ওখান থেকে আরও এক রাত পরে বিকালে শ্রীনগরে পৌঁছোনো। মনে আছে ৮ই মে বৃহস্পতিবার জম্মু তাওয়াই-এ চেপে রবিবার বিকালে শ্রীনগরে আসা। মাঝে কাটবে একরাত্রি বাসে। বানিহাল টানেলের দীর্ঘ পথে যতটা বিস্মৃত হয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি পুলকিত হয়েছি হিমালয়ের অন্তহীন তুষার শৃঙ্গের শুভ্র রূপে। সেই প্রথম পাহাড়ের মাথায় স্নো পিক দেখা। তা এত সুন্দর, রমণীয় তা ভাবতেই পারিনি। চারদিকে পাহাড়, সবুজ অরণ্য নিচে গভীর খাদ, শৈল শহরের চির পরিচিত এই দৃশ্য সেই প্রথম দেখা তারপর হিমাচল প্রদেশ, গাড়োয়াল এবং কুমায়ুনের সব পাহাড়ের দেশ ঘুরেও জম্মু থেকে শ্রীনগর যাত্রারপথ শোভার সৌন্দর্য আজও আমাকে মুগ্ধ করে। কারও সঙ্গে তুলনা চলে না। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক পর্বত ভ্রমণ। অতুলনীয় সৌন্দর্য। এরপর দ্বিতীয়বার আমার কাশ্মীর ভ্রমণ হয়নি। জানি না আজ ওই পথে গেলে সেই আনন্দ উন্মাদনা উপভোগ করব কী না। ডাল লেক আমাকে মুগ্ধ করেনি, তেমনি কিছু আলাদা আকর্ষণ বোধ করিনি ক'-দিন হাউসবোটে থাকার। কিন্তু বৈচিত্র এবং অন্যরকম অভিজ্ঞতায় তা রোমঞ্চকর হয়েছিল। অভিনব দিনযাপনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনে রেখাপাত করেছিল। একটা সমস্যা তাৎক্ষণিক অসুবিধা সৃষ্টি করল—খুশিমতো শহরে যাওয়া আসা সম্ভব নয়। কারণ যতক্ষণ না ডিঙা অমাাকে নিয়ে ডাঙায় উঠছে ততক্ষণ সেই বোটেই আমাকে থাকতে হবে। ইচ্ছেমতো শহর ঘোরা, কোথাও যাওয়া অসম্ভব। ডাল লেক দেখতে সুন্দর উপর থেকে বরং বোটে করে বা শিকারায় যখন খাঁড়ির মধ্যে জলবিহার করেছিলাম তা অনেক বেশি মনোরম হয়েছিল। সবচেয়ে পুলকিত হয়েছিলাম কাশ্মীর গার্ডেনস-এর মনোমুগ্ধ রূপে। মোগল গার্ডেন, শালিমার গার্ডেন, চেসমা শাহি গার্ডেন, আচ্ছাবল গার্ডেন সবই অপূর্ব সুন্দর। উদ্যানগুলির বৈশিষ্ট্য শুধু প্রস্ফুটিত দৃষ্টিনন্দন পুষ্প শোভায় নয়, তার অনন্য বিন্যাসে, নানা স্তরে নানাভাবে গঠিত সিঁড়ির আকারে নানা রূপে বৈচিত্র—ঝর্ণা, চাতাল, লতাগুল্মে শোভিত টিলা—সেখানে জলধারার পতন সবই অভিনব। চেশমা শাহি উদ্যানের এমনি জলধারার জল এত স্বাস্থ্যকর যে শোনা যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এখানে এলে সেই জল পান করতেন।

সেবার কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। দুদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি। ফলে ঠান্ডা পড়েছে জব্বর। গুলমার্গে চলেছি আমরা। ট্যানমার্গ থেকে ঘোড়ার পিঠে। প্রচণ্ড ঠান্ডা। হাত-পা অবশ হবার মতো। বৃষ্টির মধ্যেই চলেছি। ভ্রমণের আনন্দ উধাও। গুলমার্গে পৌঁছে সবাই ছুটছে রেস্টহাউসে আগুনের উত্তাপ পেতে। গুলমার্গের সৌন্দর্য